আল ক্বামার

৫৪

নামকরণ

সূরার সর্ব প্রথম আয়াতের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এভাবে নামকরণের তাৎপর্য হচ্ছে এটি সেই সূরা যার মধ্যে الْقَمَر শব্দ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মধ্যে চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার উল্লেখ আছে। এ থেকেই এর নাযিলের সময়–কাল চিহ্নিত হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার এ ঘটনা হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় মিনা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেররা যে হঠকারিতার পন্থা অবলম্বন করে আসছিলো এ সূরায় সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিচ্ছিলেন তা যে সত্যিই সংঘটিত হতে পারে এবং তার আগমনের সময় যে অত্যন্ত নিকটবর্তী–চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। চন্দ্রের মত একটি বিশাল উপগ্রহ তাদের চোখের সামনে বিদীর্ণ হয়েছিলো। তার দু'টি অংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি আরেকটি থেকে এত দূরে চলে গিয়েছিলো যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা একটি খণ্ডকে পাহাড়ের এক পাশে এবং অপর খণ্ডটিকে অপর পাশে দেখতে পেয়েছিলো। তারপর দু'টি অংশ মুহূর্তের মধ্যে আবার পরস্পর সংযুক্ত হয়েছিলো। বিশ্ব ব্যবস্থা যে অনাদি, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর নয়, বরং তা ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হতে পারে এটা তার অকাট্য প্রমাণ। বড় বড় তারকা ও গ্রহরাজি ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে পারে, একটি আরেকটির ওপর আছড়ে পড়তে পারে এবং কিয়ামতের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনে তার যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তার সব কিছুই যে ঘটতে পারে, শুধু তাই নয় বরং এ ঘটনা এ ইংগিতও দিচ্ছিলো যে, বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন হওয়ার সূচনা হয়ে গিয়েছে এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় অতি নিকটে এসে পড়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকটির প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ তোমরা দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কিন্তু কাফেররা এ ঘটনাকে যাদুর বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করলো এবং তা না মানতে বদ্ধপরিকর রইল। এ হঠকারিতার জন্য তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে।

বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব লোক যুক্তি তর্কও মানে না, ইতিহাস থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না, স্পষ্ট নিদর্শনাদি চোখে দেখেও বিশ্বাস করে না। এরা কেবল তখনই মানবে যখন সত্যি সত্যিই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং এরা কবর থেকে উঠে হাশরের দিনের একচ্ছত্র অধিপতির দিকে ছুটে যেতে থাকবে।

এরপর তাদের সামনে নূহের কওম, আদ, সামূদ, লূতের কওম এবং ফেরাউনের অনুসারীদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের সাবধান বাণীসমূহ অমান্য করে এসব জাতি কি ভয়াবহ আযাবে নিপতিত হয়েছিলো। এভাবে এক একটি জাতির কাহিনী বর্ণনা করার পর বারবার বলা হয়েছে যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের সহজ মাধ্যম। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কোন জাতি যদি সঠিক পথ অনুসরণ করে তাহলে এসব কওমের ওপর যে আযাব এসেছে তা তাদের ওপর কখনো আসতে পারে না।

কিন্তু এটা কোন্ ধরনের নির্বুদ্ধিতা যে, এই সহজলভ্য উৎস থেকে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কেউ গোঁ ধরে থাকবে যে, আযাবে নিপতিত না হওয়া পর্যন্ত মানবে না।

একইভাবে অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করার পর মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, যে কর্মপন্থা গ্রহণের কারণে অপরাপর জাতিসমূহ সাজা প্রাপ্ত হয়েছে তোমরাও যদি সেই একই কর্মপন্থা গ্রহণ করো তাহলে তোমরাই বা শাস্তি পাবে না কেন? তোমাদের কি আলাদা কোন বৈশিষ্ট আছে যে, তোমাদের সাথে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করা হবে? নাকি এই মর্মে ক্ষমার কোন বিশেষ সনদ লিখিতভাবে তোমাদের কাছে এসেছে যে, অন্যদেরকে যে অপরাধে পাকড়াও করা হয়েছে সেই একই অপরাধ করলেও তোমাদের পাকড়াও করা হবে না? আর তোমরা যদি নিজেদের দলীয় বা সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে গর্বিত হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের এ সংঘবদ্ধ শক্তিকে অচিরেই পরাজিত হয়ে পালাতে দেখা যাবে। সর্বোপরি কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে এর চেয়েও কঠোর আচরণ করা হবে।

সবশেষে কাফেরদের বলা হয়েছে, কিয়ামত সংঘটনের জন্য আল্লাহ তা'আলার বড় কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তাঁর আদেশ হওয়া মাত্র চোখের পলকে তা সংঘটিত হবে। তবে সব কিছুর মতই বিশ্ব ব্যবস্থা ও মানব জাতির জন্যও একটা "তাকদীর" বা পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ আছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে এ কাজের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় আছে সে সময়েই তা হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ চ্যালেঞ্জ করলো আর অমনি তাকে স্বমতে আনার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করে দেয়া হলো এমনটা হতে পারে না। তা সংঘটিত হচ্ছে না দেখে তোমরা যদি বিদ্রোহ করে বসো তাহলে নিজেদের দুষ্কর্মের প্রতিফলই ভোগ করবে। আল্লাহর কাছে তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি প্রস্তুত হচ্ছে। তোমাদের ছোট বড় কোন তৎপরতাই তাতে লিপিবদ্ধ হওয়া থেকে বাদ পড়ছে না।

সূরা আল ক্বামার–মক্কী

আয়াত ৫৫ রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝١ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣

কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।[১] কিন্তু এসব লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা যে নিদর্শনই দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এ তো গতানুগতিক যাদু।[২] এরা (একেও) অস্বীকার করলো এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করলো।[৩] প্রত্যেক বিষয়কে শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতি লাভ করতে হয়।[৪]

১. অর্থাৎ যে কিয়ামতের সংঘটিত হওয়ার খবর তোমাদের দিয়ে আসা হচ্ছে তার সময় যে ঘনিয়ে এসেছে এবং বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার সূচনা যে হয়ে গিয়েছে, চাঁদ বিদীর্ণ হওয়াই তার প্রমাণ। তাছাড়া চাঁদের মত একটি বিশাল জ্যোতিষ্কের বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার ঘটনা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, যে কিয়ামতের কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চাঁদ যখন বিদীর্ণ হতে পারে তখন পৃথিবীও বিদীর্ণ হতে পারে, তারকা ও গ্রহরাজির কক্ষপথ ও পরিবর্তিত হতে পারে, উর্ধজগতের গোটা ব্যবস্থাই ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। এর মধ্যেকার কোনটিই অনাদি, চিরস্থায়ী এবং স্থির ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে না।

কেউ কেউ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন, এভাবে যে, "চাঁদ বিদীর্ণ হবে" আরবী ভাষার বাকরীতি অনুসারে এ অর্থ গ্রহণ সম্ভব হলেও বাক্যের পূর্বাপর প্রসংগের সাথে এ অর্থ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। প্রথমত এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের প্রথম অংশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় চাঁদ যদি বিদীর্ণ না হয়ে থাকে বরং ভবিষ্যতে কোন এক সময় বিদীর্ণ হয় তাহলে তার ভিত্তিতে একথা বলা একেবারেই নিরর্থক যে, কিয়ামতের সময় সন্নিকটবর্তী হয়েছে। ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন ঘটনা কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ হতে পারে কি করে যে তাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যুক্তিযুক্ত হবে? দ্বিতীয়ত এ অর্থ গ্রহণ করার পর যখন আমরা পরবর্তী বাক্য পাঠ করি তখন বুঝা যায় যে, এর সাথে তার কোন মিল নেই। পরবর্তী আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, লোকেরা সে সময় কোন নিদর্শন দেখেছিলো যা ছিল কিয়ামতের সম্ভাব্যতার স্পষ্ট

প্রমাণ। কিন্তু তারা তাকে যাদুর তেলেসমাতি আখ্যায়িত করে অস্বীকার করেছিলো এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় বলে নিজেদের বদ্ধমূল ধারণা আঁকড়ে ধরে পড়েছিলো। যদি اِنْشَقَّ الْقَمَرُ কথাটির অর্থ "চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে" গ্রহণ করা হয় তাহলেই কেবল পূর্বাপর প্রসংগের মাঝে তা খাপ খায়। কিন্তু এর অর্থ যদি "বিদীর্ণ হবে" গ্রহণ করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে পরবর্তী সব কথাই সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মাঝে এ অংশটি জুড়ে দিয়ে দেখুন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, একথাটির কারণে গোটা বক্তব্যই অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

"কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হবে। কিন্তু এসব লোকের অবস্থা হচ্ছে, তারা যে নিদর্শনই দেখে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এতো গতানুগতিক যাদু। এরা অস্বীকার করলো এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করলো।"

সুতরাং প্রকৃত সত্য এই যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত তা কেবল হাদীসের বর্ণনা সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তবে হাদীস সমূহের বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি সবিস্তারে জানা যায় এবং তা কবে ও কোথায় সংঘটিত হয়েছিলো তাও অবহিত হওয়া যায়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ, আবু 'উওয়ানা, আবু দাউদ তায়ালেসী, আবদুর রায্‌যাক, ইবনে জারীর, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু'য়াইম ইস্পাহানী বিপুল সংখ্যক সনদের মাধ্যমে হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত হুযাইফা, হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত জুবাইর ইবনে মুত'এম থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এসব সম্মানিত সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনজন অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা ও হযরত জুবাইর ইবনে মুত'এম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তাঁরা এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তাছাড়া তাঁদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি আছেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী নন। কারণ এটা তাদের মধ্যে একজনের (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) জন্মের পূর্বের ঘটনা। আর অপরজন ঘটনার সময় শিশু ছিলেন। কিন্তু তারা উভয়েই যেহেতু সাহাবী। তাই যেসব বয়স্ক সাহাবা এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন তাঁদের নিকট থেকে শুনেই হয়তো তারা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সমস্ত রেওয়ায়াত একত্রিত করলে এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় তা হচ্ছে, এটি হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। সেদিন ছিল চান্দ্র মাসের চতুর্দশ রাত্রি। চাঁদ তখন সবে মাত্র উদিত হয়েছিলো। অকস্মাত তা দ্বিখণ্ডিত হলো এবং তার একটি অংশ সম্মুখের পাহাড়ের এক দিকে আর অপর অংশ অপরদিকে পরিদৃষ্ট হলো। এ অবস্থা অল্প কিছু সময় মাত্র স্থিতি পায়। এর পরক্ষণেই উভয় অংশ আবার পরস্পর সংযুক্ত হয়। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় মিনাতে অবস্থান করছিলেন। তিনি লোকদের বললেন ঃ দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কাফেররা বললো ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ওপর যাদু করেছিলো তাই আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছিল। অন্যেরা বললো ঃ মুহাম্মাদ আমাদের ওপর যাদু করতে পারে, তাই বলে সমস্ত মানুষকে তো যাদু করতে সক্ষম নয়। বাইরের লোকদের আসতে দাও। আমরা তাদেরকেও জিজ্ঞেস করবো,

তারাও এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে কি না। বাইরে থেকে কিছু লোক আসলে তারা বললো যে, তারাও এ দৃশ্য দেখেছে।

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত কোন কোন রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা একবার নয়, দুইবার সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু প্রথমত সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ এ কথা বর্ণনা করেননি। দ্বিতীয়ত হযরত আনাসের কোন কোন রেওয়ায়াতে (مَرَّتَيْنِ) দুইবার কথাটি উল্লেখিত হয়েছে এবং কোন কোনটিতে فِرْقَتَيْنِ বা شِقَّتَيْنِ (দুই খণ্ড) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। তৃতীয়ত, কুরআন মজীদে শুধু একবার খণ্ডিত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে সঠিক কথা এটিই যে এ ঘটনা শুধু একবারই সংঘটিত হয়েছিলো।

এ সম্পর্কে সমাজে কিছু কিচ্ছাকাহিনীও প্রচলিত আছে। ওগুলোতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুল দিয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করলেন আর তা দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। তাছাড়া চাঁদের একাট অংশ নবীর (সা) জামার গলদেশ দিয়ে প্রবেশ করে হাতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল। এসব একেবারেই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ ঘটনার সত্যিকার ধরন ও প্রকৃতি কি ছিল? এটা কি কোন মু'জিযা ছিল যা মক্কার কাফেরদের দাবীর প্রেক্ষিতে রিসালাতের প্রমাণ হিসেবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছিলেন ? নাকি এটা কোন দুর্ঘটনা ছিল যা আল্লাহর কুদরত বা অসীম ক্ষমতায় চাঁদের বুকে সংঘটিত হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শুধু এই জন্য যে, তা কিয়ামতের সম্ভাব্যতাও সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। মুসলিম মনীষীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী এ ঘটনাকে নবীর (সা) মু'জিযা হিসেবে গণ্য করেন। তাঁদের ধারণা অনুসারে মক্কার কাফেরদের দাবীর কারণে এ মু'জিযা দেখানো হয়েছিলো। কিন্তু হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসসমূহের দু'য়েকটির ওপর ভিত্তি করেই এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য আর কোন সাহাবীই এ কথা বর্ণনা করেননি। ইবনে হাজার তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন ঃ "যতগুলো সূত্রে এ ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে হযরত আনাস বর্ণিত হাদীস ছাড়া আর কোথাও এ কথা আমার চোখে পড়েনি যে, মুশরিকদের দাবীর কারণে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল।" بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ । আবু নুয়াইম ইস্পাহানী "দালায়েলুন নবুওয়াত" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকেও একই বিষয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তার সনদ দুর্বল। মজবুত সনদে হাদীস গ্রন্থসমূহে যতগুলো হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতেই একথার উল্লেখ নেই। তাছাড়া হযরত আনাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস উভয়ই এ ঘটনার সম সাময়িক ছিলেন না। অপর দিকে যেসব সাহাবাকিরাম সে সময় বর্তমান ছিলেন— যেমন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত হুযাইফা (রা), হযরত জুবাইর (রা) ইবনে মুত'এম, হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর–তাঁদের কেউ-ই এ কথা বলেননি যে, মক্কার মুশরিকরা নবীর (সা) নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে কোন নির্দশনের দাবী করেছিলো এবং সে কারণেই তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার এ মু'জিযা দেখানো হয়েছিলো। সব চেয়ে বড় কথা, কুরআন মজীদ এ ঘটনাকে মুহাম্মাদের (সা) রিসালাতের নিদর্শন হিসেবে পেশ

করছে না, বরং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন হিসেবে পেশ করছে। তবে নবী (সা) লোকদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিয়েছিলেন এ ঘটনা তার সত্যতা প্রমাণ করছিলো। সুতরাং এদিক দিয়ে এ ঘটনা অবশ্যই তাঁর নবুওয়াতেরও সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল।

বিরুদ্ধবাদীরা এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। প্রথমত, তাদের মতে এরূপ ঘটা আদৌ সম্ভব নয় যে, চাঁদের মত বিশালায়তন একটি উপগ্রহ বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যাবে এবং খণ্ড দু'টি পরস্পর শত সহস্র মাইল দূরত্বে চলে যাওয়ার পর আবার পরস্পর সংযুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত, তারা বলে, এ ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তাহলে তা দুনিয়াময় প্রচার হয়ে যেতো, ইতিহাসে তার উল্লেখ দেখা যেতো এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে তার বর্ণনা থাকতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি আপত্তি গুরুত্বহীন। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার সম্ভাব্যতার প্রশ্নে বলা যায়, তা সম্ভব নয় একথা প্রাচীন কালে হয়তো বা গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহসমূহের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে বর্তমানে মানুষ যে জ্ঞান ও তথ্য লাভ করেছে তার ভিত্তিতে একটি গ্রহ তার আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতের কারণে বিদীর্ণ হতে পারে। এ ভয়ানক বিস্ফোরণের ফলে তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বহুদূরে চলে যেতে পারে এবং তার কেন্দ্রের চৌম্বক শক্তির কারণে পুনরায় পরস্পর সংযুক্ত হতে পারে। এটা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এরপর দ্বিতীয় আপত্তির গুরুত্বহীন হওয়া সম্পর্কে বলা যায়, এ ঘটনা অকস্মাৎ এক মুহূর্তের জন্য সংঘটিত হয়েছিল। সে বিশেষ মুহূর্তে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি চাঁদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে এটা জরুরী নয়। সে মুহূর্তে বিস্ফোরণের কোন শব্দ হয়নি যে, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এ উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নেই কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি যে লোকজন তার অপেক্ষায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র তা দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভব ছিল না। সে সময় শুধু আরব ও তার পূর্বাঞ্চল সন্নিহিত দেশ সমূহেই চন্দ্র উদিত হয়েছিল। সে সময় ইতিহাস চর্চার রুচি ও প্রবণতা ছিল না এবং স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবেও সে সময় তা এতটা উন্নত ছিল না যে, পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের যেসব লোক তা দেখেছিলো তারা তা লিপিবদ্ধ করে নিতো, কোন ঐতিহাসিকের কাছে এসব প্রমাণাদি সংগৃহীত থাকতো এবং কোন গ্রন্থে সে তা লিপিবদ্ধ করতো। তা সত্ত্বেও মালাবারের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, সেরাতে সেখানকার একজন রাজা এ দৃশ্য দেখেছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ও পঞ্জিকাসমূহে এ ঘটনার উল্লেখ কেবল তখনই থাকা জরুরী হতো যদি এর দ্বারা চন্দ্রের গতি, তার পরিক্রমণের পথ এবং উদয়াস্তের সময়ে কোন পরিবর্তন সূচিত হতো। কিন্তু তা যেহেতু হয়নি, তাই প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদদের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। সে যুগের মানমন্দিরসমূহও এতটা উন্নত ছিল না যে, নভোমণ্ডলে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনাই তারা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডভুক্ত করতে পারতেন।

২. মূল ইবারতে سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতদিন একের পর এক যে যাদু চালিয়ে যাচ্ছেন, নাউযুবিল্লাহ—এটিও তার একটি। দুই, এটা পাকা যাদু। অত্যন্ত নিপুণভাবে এটি দেখানো হয়েছে। তিন, অন্য সব যাদু যেভাবে অতীত হয়ে গিয়েছে এটিও সেভাবে অতীত হয়ে যাবে, এর দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব পড়বে না।

وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ﴿٥﴾
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا أَبْصَٰرُهُمْ
يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُّهْطِعِينَ إِلَى
ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

এসব লোকদের কাছে (পূর্ববর্তী জাতি সমূহের) সেসব পরিণতির খবর অবশ্যই এসেছে যার মধ্যে অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত রাখার মত যথেষ্ট শিক্ষনীয় বিষয় আছে। আরো আছে এমন যুক্তি যা নসীহতের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে। কিন্তু সাবধানবাণী তাদের জন্য ফলপ্রদ হয় না। অতএব হে নবী, এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।[৫] যেদিন আহবানকারী একটি অত্যন্ত অপছন্দনীয়[৬] জিনিসের দিকে আহবান জানাবে, লোকেরা ভীত বিহবল দৃষ্টি নিয়ে[৭] নিজ নিজ কবর থেকে[৮] এমনভাবে উঠে আসবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পতঙ্গরাজি। তারা আহবানকারীর দিকে দৌড়িয়ে যেতে থাকবে। আর সেসব অস্বীকারকারী (যারা দুনিয়াতে তা অস্বীকার করতো) সে সময় বলবে, এ তো বড় কঠিন দিন।

৩. অর্থাৎ কিয়ামত বিশ্বাস না করার যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে রেখেছে এ নিদর্শন দেখার পরও তারা সেটিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। কিয়ামতকে বিশ্বাস করা যেহেতু তাদের প্রবৃত্তির আকাংখার পরিপন্থী ছিল, তাই সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও এরা তা মেনে নিতে রাজী হয়নি।

৪. এর অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবান জানাতে থাকবেন আর তোমরা হঠকারিতা করে নিজেদের বাতিল মত ও পথের ওপর অবিচল থাকবে, এ অবস্থা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে পারে না। তাঁর ন্যায় ও সত্যপন্থী হওয়া এবং তোমাদের বাতিল পন্থী হওয়া কখনো প্রমাণিত হবে না, তা হতে পারে না। সব কিছুই শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতি লাভ করে। অনুরূপভাবে তোমাদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে তারও একটি অনিবার্য পরিণাম আছে। তাকে অবশ্যই সে পরিণাম লাভ করতে হবে। এমন একটি সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন প্রকাশ্যে প্রমাণিত হবে যে, তিনি ন্যায় ও সত্যের পথে ছিলেন আর তোমরা বাতিলের অনুসরণ করছিলে। অনুরূপভাবে যারা ন্যায় ও সত্যপন্থী, তারা ন্যায় ও সত্যপন্থা অনুসরণের এবং যারা বাতিল পন্থী, তারা বাতিল পন্থা অনুসরণের ফলও একদিন অবশ্যই লাভ করবে।

৫. অন্য কথায় এদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। আখেরাত অস্বীকৃতির পরিণাম ও ফলাফল কি এবং অপরাপর জাতিসমূহ নবী-রসূলদের কথা না মানার যে দৃষ্টান্তমূলক

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

এদের পূর্বে নূহের (আ) জাতিও অস্বীকার করেছে।[৯] তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে, এবং বলেছে, এ লোকটি পাগল। উপরন্তু তাকে তীব্রভাবে তিরস্কারও করা হয়েছে।[১০] অবশেষে সে তার রবকে উদ্দেশ্য করে বললো; আমি পরাভূত হয়েছি, এখন তুমি এদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। তখন আমি আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলাম এবং যমীন বিদীর্ণ করে ঝর্ণাধারায় রূপান্তরিত করলাম।[১১] এ পানির সবটাই সেই কাজ পূর্ণ করার জন্য সংগৃহীত হলো যা আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল।

শাস্তি ভোগ করেছে তা যখন এদেরকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় বুঝানো হয়েছে এবং মানবেতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে বলে দেয়া হয়েছে, তারপরও এরা যদি হঠকারিতা পরিহার না করে তাহলে তাদেরকে এ বোকার স্বর্গেই বাস করতে দাও। এরপর এরা কেবল তখনই তোমার কথা মেনে নেবে যখন মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে নিজের চোখে দেখবে, কিয়ামত শুরু হয়ে গিয়েছে। তখন স্বচক্ষেই দেখতে পাবে যে, যে কিয়ামত সম্পর্কে তাদেরকে আগে ভাগেই সাবধান করে দিয়ে সঠিক পথ অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হতো তা যথারীতি শুরু হয়ে গেছে।

৬. আরেকটি অর্থ অজানা–অচেনা জিনিসও হতে পারে। অর্থাৎ এমন জিনিস যা কখনো তাদের কল্পনায়ও স্থান পায়নি, যার কোন চিত্র বা ধারণা তাদের মগজে ছিল না, কোন সময় এ ধরনের কোন কিছুর মুখোমুখি হতে হবে সে অনুমানও তারা করতে পারেনি।

৭. মূল শব্দ হচ্ছে خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি আনত থাকবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, ভীতি ও আতঙ্ক তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। দুই, তাদের মধ্যে লজ্জা ও অপমানবোধ জাগ্রত হবে এবং চেহারায় তার বহিপ্রকাশ ঘটবে। কারণ, কবর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র তারা বুঝতে পারবে যে, এটিই সে পরকালীন জীবন যা আমরা অস্বীকার করতাম। যে জীবনের জন্য আমরা কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসিনি এবং যে জীবনে এখন আমাদেরকে অপরাধী হিসেবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। তিন, তারা হতবুদ্ধি হয়ে তাদের চোখের সামনে বিদ্যমান সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে থাকবে। তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার হুঁশও তাদের থাকবে না।

৮. কবর বলতে শুধুমাত্র সেসব কবরই বুঝানো হয়নি মাটি খুঁড়ে যার মধ্যে কাউকে যথারীতি দাফন করা হয়েছে। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যেখানেই কোন ব্যক্তি মৃত্যু

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

আর নূহকে (আ) আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত[১২] বাহনে আরোহন করিয়ে দিলাম যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিলো। এ ছিলো সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়েছিলো।[১৩] সে নৌকাকে আমি একটি নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছি।[১৪] এমতাবস্থায় উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি? দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধান বাণী। আমি এ কুরআনকে উপদেশ লাভের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি।[১৫] এমতাবস্থায় উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?

বরণ করেছে কিংবা যেখানেই তার দেহ পড়েছিল হাশরের ময়দানের দিকে আহবানকারীর একটি আওয়াজ শুনেই সে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে।

৯. অর্থাৎ অখেরাত সংঘটিত হবে যেখানে মানুষকে তার কাজ কর্মের হিসেব দিতে হবে এ কথাটাই তারা অবিশ্বাস করেছে, যে নবী তাঁর জাতিকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করে আসছিলো সে নবীকেও অস্বীকার করেছে, আখেরাতের জিজ্ঞাসাবাদে সফলকাম হওয়ার জন্য মানুষকে কিরূপ আকীদা বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, কি ধরনের কাজ করতে হবে এবং কোন্ জিনিস পরিহার করে চলতে হবে এসব সম্পর্কে নবী যা শিক্ষা দিতেন তাও তারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

১০ অর্থাৎ এ লোকেরা নবীকে অস্বীকার ও অমান্যই শুধু করেনি, তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে, তাঁকে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেছে, তাঁর প্রতি অভিশাপ ও তিরস্কার বর্ষণ করেছে, হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে সত্য প্রচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে এবং তাঁর জীবন ধারণ অসম্ভব করে তুলেছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে এমনভাবে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকলো, যেন তা ভু-পৃষ্ঠ নয়, অসংখ্য ঝর্ণাধারা।

১২. অর্থাৎ প্লাবন আসার পূর্বেই আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আ) যে জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন।

১৩. মূল ইবারত হচ্ছে جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ অর্থাৎ এসব করা হয়েছে সে ব্যক্তির কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাকে অবমাননা ও অসম্মান করা হয়েছিল। كفر শব্দটিকে যদি অস্বীকৃতি অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ হবে "যার কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। আর যদি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বা অস্বীকৃতি অর্থে গ্রহণ

করা হয় তাহলে তার অর্থ হয়" যার সত্তা ছিল একটি নিয়ামত স্বরূপ তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকৃতির আচরণ করা হয়েছিল।

১৪. এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা এ আযাবকে শিক্ষণীয় নির্দশন বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের মতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার যোগ্য অর্থ হচ্ছে, সে জাহাজকে শিক্ষনীয় নিদর্শন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি সুউচ্চ পর্বতের ওপরে তার অস্তিত্ব টিকে থাকা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর গযব সম্পর্কে সাবধান করে আসছে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এ ভূ-খণ্ডে আল্লাহর নাফরমানদের জন্য কি দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল এবং ঈমান গ্রহণকারীদের কিভাবে রক্ষা করা হয়েছিল। ইমাম বুখারী, ইবনে আবী হাতেম, আবদুর রায্যাক ও ইবনে জারীর কাতাদা থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের ইরাক ও আল-জাযিরা বিজয়ের যুগে এ জাহাজ জুদী পাহাড়ের ওপর (অন্য একটি রেওয়ায়াত অনুসারে "বা-কিরদা" নামক জনপদের সন্নিকটে) বর্তমান ছিল এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ তা দেখেছিলেন। বর্তমান যুগেও বিমান ভ্রমণের সময় কেউ কেউ এ এলাকার একটি পর্বত শীর্ষে জাহাজের মত বস্তু পড়ে থাকতে দেখেছেন। সেটিকে নূহের জাহাজ বলে সন্দেহ করা হয়। আর এ কারণেই তা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে অভিযাত্রী দল অভিযান পরিচালনা করে আসছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা-৪৭, হূদ, টীকা-৪৬; আল আনকাবূত, টীকা-২৫)

১৫. কেউ কেউ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ কথাটির ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কুরআন একখানা সহজ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ বুঝার জন্য কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এমনকি আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ছাড়াই যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এর তাফসীর করতে পারে এবং হাদীস ও ফিকাহর সাহায্য ছাড়াই কুরআনের আয়াত থেকে যে কোন আইন ও বিধান উদ্ভাবন করতে পারে। অথচ পূর্বাপর যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে সে দিকে লক্ষ রেখে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, একথাটির উদ্দেশ্য মানুষকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করানো যে, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের একটি উৎস হচ্ছে বিদ্রোহী জাতিসমূহের ওপর নাযিল হওয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আরেকটি উৎস হলো এ কুরআন যা যুক্তি প্রমাণ ও ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে তোমাদেরকে সরল সহজ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। প্রথমোক্ত উৎসের তুলনায় নসীহতের এ উৎস অধিক সহজ। এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা এ থেকে কল্যাণ লাভ করছো না এবং আযাব দেখার জন্যই গোঁ ধরে আছ? এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে এ কিতাব পাঠিয়ে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে তোমরা যে পথে চলছো তা চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া তোমাদের কল্যাণ কোন্ পথে তাও বলে দেয়া হয়েছে। নসীহতের এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এজন্য যাতে ধ্বংসের গহবরে পতিত হওয়ার আগেই তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করা যায়। সহজভাবে বুঝানোর পরও যে ব্যক্তি মানে না এবং গর্তের মধ্যে পতিত হওয়ার পরই কেবল স্বীকার করে যে, এটি সত্যিই গর্ত তার চেয়ে নির্বোধ আর কে আছে?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

আদ জাতি অস্বীকার করেছিলো। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী। আমি এক বিরামহীন অশুভ দিনে১৬ তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পাঠালাম যা তাদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলছিলো যেন তারা সমূলে উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী। আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। অতপর উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?

১৬. অর্থাৎ এমন একটি দিন যার দুর্যোগ ও দুর্ভোগ একাধারে কয়েকদিন ধরে চলেছিল। সূরা حٰم السجده এর ১৬ আয়াতে فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সূরা الحاقة আল হাক্কার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই ঝঞ্ঝা বাত্যা একাধারে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত চলেছিল। সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ কথা হলো, এ আযাব যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন ছিল বুধবার। এ কারণে মানুষের মধ্যে এ ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, বুধবার দিনটি হচ্ছে অশুভ। তাই এ দিনে কোন কাজ শুরু করা উচিত নয়। এ বিষয়ে কিছু যয়ীফ হাদীসও উদ্ধৃত করা হয়েছে যার কারণে এ দিনটির অশুভ হওয়ার বিশ্বাস সাধারণের মনমগজে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ইবনে মারদূইয়া ও খতীব বাগদাদীর বর্ণিত এ হাদীসটিও আছে যে, اخر اربعاء فى الشهر يوم نحس مستمر (মাসের শেষ বুধবার অশুভ, যার অশুভ প্রভাব একাধারে চলতে থাকে। ইবনে জাওযী একে 'মাওযূ' অর্থাৎ জাল ও মনগড়া হাদীস বলেছেন। ইবনে রজব বলেছেন, এ হাদীস সহীহ নয়। হাফেজ সাখাবী বলেন ঃ এ হাদীস যতগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা সবই একেবারে ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে তাবারানী বর্ণিত এই হাদীস يوم الاربعاء يوم نحس مستمر (বুধবার দিনটি অশুভ দিন যার অকল্যাণ ক্রমাগত চলতে থাকে)। আরো কিছু সংখ্যক হাদীসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, বুধবার দিন যেন ভ্রমণ না করা হয়, লেনদেন না করা হয়। নখ না কাটানো হয় এবং রোগীর সেবা না করা হয়। কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ এ দিনেই শুরু হয়। কিন্তু এসব হাদীসের সব কটিই যয়ীফ। এর ওপরে কোন আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। বিশেষজ্ঞ মুনাভী বলেন ঃ

توقى الاربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم ، اذ الايام كلها لله تعالى ، لا تنفع ولا تضر بذاتها –

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝٢٣ فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ۝٢٤ أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۝٢٥ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۝٢٦ إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ۝٢٧

২য় রুকূ'

সামূদ সাবধান বাণীসমূহ অস্বীকার করলো এবং বলতে লাগলো "এখন কি আমরা আমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তিকে এককভাবে মেনে চলবো?[১৭] আমরা যদি তার আনুগত্য গ্রহণ করি তাহলে তার অর্থ হবে আমরা বিপথগামী হয়েছি এবং আমাদের বিবেক–বুদ্ধির মাথা খেয়েছি। আমাদের মধ্যে কি একা এই ব্যক্তিই ছিল যার ওপর আল্লাহর যিকর নাযিল করা হয়েছে? না, বরং এ চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।[১৮] (আমি আমার নবীকে বললাম) কে চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক তা এরা কালকেই জানতে পারবে। আমি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা বানিয়ে পাঠাচ্ছি। এখন একটু ধৈর্য ধরে দেখ, এদের পরিণতি কি হয়।

"অশুভ লক্ষণসূচক মনে করে বুধবারের দিনকে পরিত্যাগ করা এবং এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষদের ন্যায় বিশ্বাস পোষণ করা কঠোরভাবে হারাম। কেননা, সব দিনই আল্লাহর। কোন দিনই দিন হিসেবে কল্যাণ বা অকল্যাণ কিছুই সাধন করতে পারে না।"

আল্লামা আলূসী বলেন ঃ "সবদিন সমান। বুধবারের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট নেই। রাত ও দিনের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত নেই যা কারো জন্য কল্যাণকর এবং কারো জন্য অকল্যাণকর নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুহূর্তেই কারো জন্য অনুকূল এবং কারো জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে থাকেন।"

১৭. অন্য কথায় তিনটি কারণে তারা হযরত সালেহ (আ) এর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। প্রথম কারণ, তিনি মানুষ, মানব সত্তার উর্ধে নন যে, আমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেব। দ্বিতীয় কারণ, তিনি আমাদের কওমেরই একজন মানুষ। আমাদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন কারণ নেই, তৃতীয় কারণ, তিনি একা, এক ব্যক্তি। আমাদের সাধারণ মানুষদেরই একজন। তিনি কোন নেতা নন। তাঁর সাথে কোন বড় দল বা সৈন্য সামন্ত নেই, সেবক সেবিকাও নেই। তাই আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারি না। তাদের মতে নবী হবে মানব সত্তার উর্ধে। আর তিনি যদি মানুষ হন তাহলে আমাদের নিজের দেশ ও জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন না, উপর থেকে নেমে আসবেন অথবা বাইরে

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

তাদের জানিয়ে দাও, এখন তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি ভাগ হবে এবং প্রত্যেকেই তার পালার দিনে পানির জন্য আসবে।”[১৯] শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের লোকটিকে ডাকলো, সে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীকে হত্যা করলো[২০] দেখ, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধান বাণীসমূহ। আমি তাদের ওপর একটি মাত্র বিকট শব্দ পাঠালাম এবং তারা খোঁয়াড়ের মালিকের শুষ্ক ও পদদলিত শস্যের মত হয়ে গেল।[২১] আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

থেকে পাঠানো হবে। তাও যদি না হয় তাহলে অন্তত তিনি হবেন নেতা। তাঁর অস্বাভাবিক শান শওকত ও জাঁকজমক থাকবে। এ কারণে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করেছেন বলে মেনে নেয়া হবে। মক্কার কাফেররাও এই মুর্খতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ। সাধারণ লোকদের মতই তিনি বাজারে চলাফেরা করেন। কাল আমাদের মাঝেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং আজ দাবী করছেন যে, আল্লাহ আমাকে নবী বানিয়েছেন. মক্কার কাফেররা এ যুক্তির ভিত্তিতেই তাঁর রিসালাত মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলো।

১৮. মূল আয়াতে اشر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ আত্মগর্বী ও দাম্ভিক ব্যক্তি যার মগজে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে এবং এ কারণে সে গর্ব প্রকাশ করে থাকে।

১৯. “আমি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা বানিয়ে পাঠাচ্ছি” এটা এ কথার ব্যাখ্যা। ফিতনাটা ছিল এই যে, হঠাৎ একটি উটনী এনে তাদের সামনে পেশ করে তাদেরকে বলে দেয়া হলো যে, একদিন এটি একা পানি পান করবে। অন্যদিন তোমরা সবাই নিজের ও তোমাদের জীব জন্তুর জন্য পানি নিতে পারবে। যেদিন উটনীর পানি পানের পালা সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিজেও কোন ঝর্ণা বা কূপের ধারে পানি নিতে আসবে না এবং তাদের জীবজন্তুকেও পানি পান করানোর জন্য আনবে না। এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেরাই বলতো যে, তার না আছে কোন সৈন্য সামন্ত, না আছে কোন বড় দল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِالنُّذُرِ (৩৩) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ
نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (৩৪) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (৩৫)
وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (৩৬) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ
فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (৩৭) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ
مُسْتَقِرٌّ (৩৮) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (৩৯) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (৪০)

লূতের কওম সাবধানবাণীসমূহ অস্বীকার করলো। আমি তাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠালাম। শুধু লূতের পরিবারের লোকেরা তা থেকে রক্ষা পেল। আমি নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে বাঁচিয়ে বের করে দিলাম। যারা কৃতজ্ঞ আমি তাদের সবাইকে এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। লূত তার কওমের লোকদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করেছিল। কিন্তু তারা সবগুলো সাবধানবাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলো এবং কথাচ্ছলেই উড়িয়ে দিল। অতপর তারা তাকে তার মেহমানদের হিফাজত করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। এখন তোমরা আমার আযাব ও সাবধানবাণীর স্বাদ আস্বাদন করো।[২২] *খুব ভোরেই একটি অপ্রতিরোধ্য আযাব তাদের ওপর আপতিত হলো। এখন আমার আযাব ও সাবধান বাণীসমূহের স্বাদ আস্বাদন করো। আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?*

২০. এ শব্দগুলো থেকে আপনা আপনি একটি পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায়। তাহলো ঐ উটনীটা অনেক দিন পর্যন্ত তাদের জনপদে দৌরাত্ম্য চালিয়েছে। তার পানি পানের নির্দিষ্ট দিনে পানির ধারে কাছে যাওয়ার সাহস কারো হতো না। অবশেষে তারা তাদের কওমের একজন দুঃসাহসী নেতাকে ডেকে বললো ঃ তুমি তো অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষ। কথায় কথায় হাতা গুটিয়ে মারতে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে যাও। একটু সাহস করে এ উটনীর ব্যাপারটা চুকিয়ে দাও তো। তাদের উৎসাহ দানের কারণে সে একাজ সমাধা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীকে মেরে ফেললো। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, উটনীর কারণে তারা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এর পেছনে অস্বাভাবিক কোন শক্তি কাজ করছে। তাই তাকে আঘাত করতে তারা ভয়

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

৩ রুকূ'

ফেরাউনের অনুসারীদের কাছেও সাবধান বাণীসমূহ এসেছিল। কিন্তু তারা আমার সবগুলো নিদর্শনকে অস্বীকার করলো। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। যেভাবে কোন মহা-পরাক্রমশালী পাকড়াও করে।

তোমাদের কাফেররা কি ঐসব লোকদের চেয়ে কোন অংশে ভাল ? নাকি আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য কোন ক্ষমা লিখিত আছে ? না কি এসব লোক বলে, আমরা একটা সংঘবদ্ধ শক্তি। নিজেরাই নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করবো। অচিরেই এ সংঘবদ্ধ শক্তি পরাজিত হবে। এবং এদের সবাইকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে দেখা যাবে।২৪

পাচ্ছিল। এ কারণে একটি উটনীকে হত্যা করা, তাদের কাছে একটি অভিযান পরিচালনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অথচ উটনীটা পেশ করেছিলেন একজন নবী যার কোন সেনাবাহিনী ছিল না, যার ভয়ে তারা ভীত ছিল। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল-আ'রাফ, টীকা-৫৮, আশ্ শূ'আরা, টীকা-১০৪, ১০৫)।

২১. যারা গবাদি পশু পালে তারা পশুর খোঁয়াড়ের সংরক্ষণ ও হিফাজতের জন্য কাঠ ও গাছের ডালপালা দিয়ে বেড়া তৈরী করে দেয়। এ বেড়ার কাঠ ও গাছ-গাছালীর ডালপালা আস্তে আস্তে শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং পশুদের আসা যাওয়ায় পদদলিত হয়ে করাতের গুঁড়ার মত হয়ে যায়। সামূদ জাতির দলিত মথিত লাশসমূহকে করাতের ঐ গুঁড়োর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

২২. এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা হূদ (আয়াত ৭৭ থেকে ৮৩) ও সূরা হিজরে (আয়াত ৬১ থেকে ৭৪) পূর্বেই দেয়া হয়েছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ জাতির ওপর আযাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কয়েকজন ফেরেশতাকে অত্যন্ত সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূতের বাড়ীতে মেহমান হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। কওমের লোকজন তাঁর কাছে এত সুশ্রী মেহমান আসতে দেখে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে চড়াও হলো এবং তাঁর কাছে দাবী করলো যে, তিনি যেন তাঁর মেহমানদের সাথে কুকর্ম করার জন্য তাদের হাতে তুলে দেন। হযরত লূত এ জঘন্য আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের কাছে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি ও অনুরোধ-উপরোধ করলেন। কিন্তু তারা তা মানলো না এবং ঘরে প্রবেশ করে জোরপূর্বক মেহমানদের বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। এ পর্যায়ে হঠাৎ তারা অন্ধ হয়ে গেল। এ

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

এদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য প্রকৃত প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে কিয়ামত। কিয়ামত অত্যন্ত কঠিন ও অতীব তিক্ত সময়। প্রকৃতপক্ষে এ পাপীরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। এদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যেদিন এদেরকে উবুড় করে আগুনের মধ্যে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন এদের বলা হবে, এখন জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ আস্বাদন করো।

আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে একটি পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।[২৫] *আমার নির্দেশ একটি মাত্র নির্দেশ হয়ে থাকে এবং তা চোখের পলকে কার্যকর হয়।*[২৬] *তোমার মত অনেককেই আমি ধ্বংস করেছি*[২৭] *আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ? তারা যা করেছে সবই রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ই লিখিতভাবে বিদ্যমান আছে।*[২৮]

আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষাকারীরা নিশ্চিতরূপে বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে, সত্যিকার মর্যাদার স্থানে মহা শক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে।

সময় ফেরেশতারা হযরত লূতকে বললেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন ভোর হওয়ার পূর্বেই যেন এ জনপদের বাইরে চলে যান। তারা জনপদের বাইরে চলে যাওয়া মাত্র ঐ জাতির ওপর এক ভয়ানক আযাব নেমে আসে। বাইবেলেও ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের ভাষা হচ্ছে ঃ তখন তাহারা লোটের উপরে ভারী চড়াও হইয়া কবাট ভাংগিতে গেল। তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন ; এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ও মহান সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন। তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে খুঁজিতে পরিশ্রান্ত হইল।-(আদি পুস্তক, ১৯ ঃ ৯-১১)

২৩. কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। এর অর্থ, তোমাদের মধ্যে এমন কি গুণ আছে এবং এমন কি মূল্যবান বৈশিষ্ট আছে যে, যে ধরনের কুফরী, সত্য প্রত্যাখ্যান ও হঠকারিতার আচরণের জন্য অন্যান্য জাতিসমূহকে শাস্তি দেয়া হয়েছে তোমরা সে একই নীতি ও আচরণ গ্রহণ করলেও তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না?

২৪. এটা একটা সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী। হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এ ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, কুরাইশদের সংঘবদ্ধ শক্তি যে শক্তি নিয়ে তাদের গর্ব ছিল অচিরেই মুসলমানদের কাছে পরাজিত হবে। সে সময় কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, অদূর ভবিষ্যতে কিভাবে এ বিপ্লব সাধিত হবে। সে সময় মুসলমানরা এমন অসহায় অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল যে, তাদের একটি দল দেশ ছেড়ে হাবশায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং অবশিষ্ট মুসলমানগণ আবু তালেব গিরি গুহায় অবরুদ্ধ ছিল। কুরাইশদের বয়কট ও অবরোধ ক্ষুধায় তাদেরকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে কে কল্পনা করতে পারতো যে, মাত্র সাত বছরের মধ্যেই অবস্থা পাল্টে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ইকরিমা বর্ণনা করেন যে, হযরত 'উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, যে সময় সূরা ক্বামারের এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে, এটা কোন্ সংঘবদ্ধ শক্তি যা পরাজিত হবে? কিন্তু বদর যুদ্ধে যখন কাফেররা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছিল সে সময় আমি দেখতে পেলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরিহিত অবস্থায় সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং তাঁর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছে سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ তখন আমি বুঝতে পারলাম এ পরাজয়ের খবরই দেয়া হয়েছিল (ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম)।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ার কোন জিনিসই উদ্দেশ্য ও লক্ষহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমিতি ও অনুপাত আছে। সে অনুসারে প্রত্যেক বস্তু একটা নির্দিষ্ট সময় অস্তিত্ব লাভ করে, একটি বিশেষ রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে। একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টিকে থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ বিশ্বজনীন নিয়ম–নীতি অনুসারে এ দুনিয়াটারও একটা 'তাকদীর' বা পরিমিতি ও অনুপাত আছে। সে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা চলছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটতে হবে। এর পরিসমাপ্তির জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার এক মুহূর্ত পূর্বে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না কিংবা এক মুহূর্ত পরে তা অবশিষ্টও থাকবে না। এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী নয় যে, চিরদিনই তা আছে এবং চিরদিন থাকবে। কিংবা কোন শিশুর খেলনাও নয় যে, যখনই তোমরা চাইবে তখনই তিনি এটাকে ধ্বংস করে দেখিয়ে দেবেন।

২৬. অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠনের জন্য আমাকে কোন বড় প্রস্তুতি নিতে হবে না কিংবা তা সংঘটিত করতে কোন দীর্ঘ সময়ও ব্যয়িত হবে না। আমার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ জারী হওয়ার সময়টুকু মাত্র লাগবে। নির্দেশ জারী হওয়া মাত্রই চোখের পলকে তা সংঘটিত হয়ে যাবে।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যদি মনে করে থাক যে, এ বিশ্ব কোন মহাজ্ঞানী ও ন্যায়বান আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন নয়, বরং এটা মগের মুল্লুক যেখানে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই—তাহলে তোমাদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য

মানবেতিহাসেই বিদ্যমান। এখানে এ নীতি অনুসারী জাতিসমূহকে একের পর এক ধ্বংস করা হয়েছে।

২৮. অর্থাৎ এ লোকেরা যেন একথা ভেবে বিভ্রান্ত না হয় যে, তাদের সম্পাদিত কাজ–কর্ম বুঝি কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছে। না, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক গোষ্ঠী এবং প্রত্যেক জাতির গোটা রেকর্ডই সংরক্ষিত আছে। যথা সময়ে তা সামনে এসে হাজির হবে।